প্রথম অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আমাদের বাংলাদেশ

পাঠ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি

- **ই-লার্নিং :** ই-লার্নিং শব্দটি ইলেকট্রনিক লার্নিং কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। পাঠদান করার জন্য সিডি রম, ইন্টারনেট, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক কিংবা টেলিভিশন চ্যানেল ব্যবহার করার পদ্ধতিকে ই-লার্নিং বলে।
- **ই-পূর্জি :** পূর্জি হচ্ছে চিনিকলসমূহে কখন আখ সরবরাহ করতে হবে সে জন্য আওতাধীন আখচাষিদের দেওয়া একটি অনুমতিপত্র। আখচাষিরা এখন এসএমএসের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে পূর্জির তথ্য পাচ্ছে বলে এখন তাদের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান হয়েছে। পাশাপাশি সময়মতো আখের সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় চিনিকলের উৎপাদনও বেড়েছে।
- **ই-পর্চা সেবা :** বর্তমানে দেশের সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে সংগ্রহ করা যায়। এটিকে বলা হয় ই-পর্চা।
- **ই-কমার্স :** ই-কমার্সে দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান লক্ষ করা যায়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কেবল নিজেদের পণ্য বিক্রয় করে থাকে। আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রয় করে।
- **সামাজিক যোগাযোগ :** সামাজিক যোগাযোগ বলতে ভার্চুয়াল যোগাযোগ ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মানুষে মানুষে মিথস্ক্রিয়াকেই বোঝায়। এর অর্থ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ যোগাযোগ ও ভাব প্রকাশের জন্য যা কিছু সৃষ্টি, বিনিময় কিংবা আদান-প্রদান করে তাই সামাজিক যোগাযোগ।
- **টুইটার (www.twitter.com) :** টুইটারও একটি সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। তবে ফেসবুকের সঙ্গে এর একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এটিতে ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ ১৪০ অক্ষরের মধ্যে তাদের মনোভাব প্রকাশ ও আদান-প্রদান করতে হয়। এজন্য এটিকে মাইক্রোব্লগিংয়ের একটি ওয়েবসাইটও বলা যায়। ১৪০ অক্ষরের এই বার্তাকে বলা হয় টুইট।
- **ই–গর্ভন্যান্স :** শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই হচ্ছে ই–গর্ভন্যান্স। এর মাধ্যমে সরকারি ব্যবস্থাসমূহকে ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব।
- **এমটিএস :** ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেমকে সংক্ষেপে এমটিএস বলে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেমের মাধ্যমে দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিরাপদে, দ্রুত, কম খরচে টাকা পাঠানো যায়। দেশের প্রায় সকল ডাকঘরে এই সেবা পাওয়া যায়।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ কুড়িগ্রামের রৌমারি উপজেলার যাদুর চর গ্রামের মিলন গ্রামে বসেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কীভাবে তাকে সাহায্য করতে পারে?

উত্তর : কুড়িগ্রামের রৌমারি উপজেলার যাদুর চর গ্রামের মিলন গ্রামে বসেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। তাকে যে পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে সেই পদ্ধতিকে ই-লার্নিং বলে। ই-লার্নিং হচ্ছে ইলেকট্রনিক লার্নিংয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে ই-লার্নিং বলতে সিডি রম, ইন্টারনেট, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক কিংবা টেলিভিশন চ্যানেল ব্যবহার করার পদ্ধতিকে বোঝায়।

বর্তমানে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের বিভিন্ন কোর্স অনলাইনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং যে কেউ সেই কোর্সটি গ্রহণ করতে পারে। ফলে মিলন উচ্চশিক্ষার কোর্স অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু সেজন্য তার কাছে অবকাঠামোগত সক্ষমতা থাকতে হবে। যেমন : কম্পিউটার, মডেম, আইএসপি, ইন্টারনেট স্পিড ইত্যাদি থাকতে হবে। মিলন উক্ত শিখনসামগ্রী ব্যবহার করে ভর্তি হওয়া প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারবে, হোমওয়ার্ক জমা দিতে পারবে, অনলাইনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ক্রেডিট অর্জন করতে পারবে। অর্থাৎ, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মিলন গ্রামে থেকেই উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারবে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ বাংলাদেশের বেকার সমস্যা দূর করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কী কী সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে? বর্ণনা কর।

উত্তর : বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানের বাজার উন্মুক্ত করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের দেশের শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভিন্ন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো আউটসোর্সিং। এটি অনেকেরই এখন পেশা হিসেবে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রতি বছর আউটসোর্সিং হতে কয়েক মিলিয়ন ডলার আয় করে। শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠী এই শিল্পকে কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও অনেকে এই খাতে বিনিয়োগ করেছে। ফলে বহু লোক সম্পৃক্ত হচ্ছে বিভিন্ন কাজে, সৃষ্টি হচ্ছে কর্মসংস্থান, দূর হচ্ছে বেকারত্ব। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের কর্মসংস্থানের খোঁজ মুহূর্তের মধ্যেই পাওয়া যায়। যেমন : www.bdjobs.com এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেশের বেকার জনগোষ্ঠী দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনলাইনে আবেদন করে চাকরি সংগ্রহ করতে পারেন। ফলে বেকারত্ব অনেকাংশ কমে যায়। এছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে এখন আমাদের দেশেও কল সেন্টার স্থাপিত হচ্ছে। এক্ষেত্রেও অনেক শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন -১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রাশেদ নিয়মিত পত্রিকা পড়ে। আজ সে পত্রিকা খুলে "একুশ শতক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি" শিরোনামে একটি লেখা দেখতে পেল। লেখাটি সে খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ল। তারপর বিষয়টি নিয়ে সে তার বাবার সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারল একুশ শতকের পৃথিবী আসলে জ্ঞানভিত্তিক একটা অর্থনীতির ওপর দাঁড়াতে শুরু করেছে। এ কারণে পৃথিবীর মানুষ নতুন

এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে জানতে চাইলে তার বাবা বলেন, "একুশ শতকে টিকে থাকতে হলে সবাইকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রাথমিক বিষয়গুলো জানতে হবে।"

ক. প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক কে? ১

খ. ই- গভর্ন্যান্স বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাশেদ ও তার বাবার আলোচিত প্রযুক্তিতে চার্লস ব্যাবেজের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. একুশ শতকে টিকে থাকার প্রয়োজনীয় দক্ষতার ব্যাপারে তুমি কি রাশেদের বাবার সাথে একমত? তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক হলেন অ্যাডা লাভলেস।

খ. গভর্ন্যান্স বা সুশাসনের জন্য দরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা। ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে সরকারি ব্যবস্থাসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। এর ফলে নাগরিকের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান ঘটে এবং দেশে সুশাসনের পথ নিষ্কণ্টক হয়। শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই হচ্ছে ই- গভর্ন্যান্স।

গ. রাশেদ ও তার বাবার আলোচিত প্রযুক্তিটির নাম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। এটি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি। একুশ শতকের এই পৃথিবীতে হয়তো এমন একজন মানুষও পাওয়া যাবে না যার জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কোনোরূপ প্রভাব ফেলেনি। আর এই প্রযুক্তির বিকাশের পেছনে যেসব বিজ্ঞানী, ভিশনারি, প্রকৌশলী এবং নির্মাতাদের অবদান রয়েছে চার্লস ব্যাবেজ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একজন ইংরেজ প্রকৌশলী ও গণিতবিদ। তার হাতেই আধুনিক কম্পিউটারের বিকাশ শুরু হয়। এ কারণে তাকে আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয়। তিনি ডিফারেনস ইঞ্জিন ও এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামে দুটি গণনা যন্ত্র তৈরি করেন। এই ইঞ্জিনগুলো যান্ত্রিকভাবে গণনা করতে পারত। তার তৈরি এনালিটিক্যাল ইঞ্জিনের বৈশিষ্ট্য আজকের কম্পিউটারের ডিজাইনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে অর্থায়নের অভাবে সে সময় ব্যাবেজ তার প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তার মৃত্যুর ১২০ বছর পর ১৯৯১ সালে লন্ডনের বিজ্ঞান জাদুঘরে তার বর্ণনা অনুসরণ করে একটি ইঞ্জিন তৈরি করলে দেখা যায় সেটি সঠিকভাবে কাজ করছে। এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, চার্লসের দুটি ইঞ্জিন্ই গণনার কাজ করতে পারত।

ঘ. একুশ শতকে টিকে থাকার প্রয়োজনীয় দক্ষতার ব্যাপারে রাশেদের বাবার বক্তব্য হলো সবাইকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রাথমিক বিষয়গুলো জানতে হবে। তার এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত। কেননা একুশ শতকে এসে সম্পদের ধারণা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। পৃথিবী একটা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির উপর দাঁড়াতে শুরু করেছে। তাই যারা এখন জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরি করার বিপ্লবে অংশ নিবে তারাই পৃথিবীর চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। তবে এই নতুন বিপ্লবে অংশ নেয়ার জন্য বিশেষ এক ধরনের প্রস্তুতি প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে বেঁচে থাকার সুনির্দিষ্ট দক্ষতাগুলো যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে সেগুলো হবে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, যোগাযোগ দক্ষতা, সুনাগরিকত্ব, সমস্যা সমাধানে পারদর্শিতা, বিশ্লেষণী চিন্তন দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং তার সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা। এসব দক্ষতার মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা হিসেবে খুব দ্রুত স্থান করে নিচ্ছে। তাই একুশ শতকে টিকে থাকার জন্য সবাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রাথমিক বিষয়গুলো জানতে হবে। কারণ এই বিষয়গুলো জানা থাকলেই কেবল একজন এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার বিশাল জগতে পা দিতে পারবে। কিন্তু একজন যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা না শিখবে, অভ্যস্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে একুশ

শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে না। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সবাইকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রাথমিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে, দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

প্রশ্ন -২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ফারহানার বাবা একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে একাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। গত মাসে তার পদোন্নতি হওয়ায় কাজের চাপ অনেক বেড়ে গেছে। অফিসে কাজের চাপ কমানোর জন্য তিনি বাড়িতে কিছু কিছু কাজ করে এগিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি কাজের সুবিধার্থে আইবিএম কোম্পানির একটি পার্সোনাল কম্পিউটার কিনে এনে তাতে ইন্টারনেটের সংযোগ লাগিয়ে দিলেন। এতে ফারহানারও পড়াশোনার অনেক সুবিধা হলো।

ক. ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের জনক কে? ১

খ. একুশ শতকের সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ফারহানার বাবার কেনা যন্ত্রটিতে বিল গেটসের অবদান- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত যন্ত্রটি ব্যবহার করে ফারহানার প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের জনক হলেন স্যার টিমোথি জন 'টিম' বার্নাস লি।

খ. একুশ শতকের সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। যার অর্থ কৃষি, খনিজ সম্পদ কিংবা শক্তির উৎস নয়, শিল্প কিংবা বাণিজ্য নয় এখন পৃথিবীর সম্পদ হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তার কারণ শুধু মানুষই জ্ঞান সৃষ্টি করতে পারে, জ্ঞান ধারণ করতে পারে এবং জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে। সম্পদের এই নতুন ধারণাটি মানুষের চিন্তা ভাবনার জগৎটি পাল্টে দিয়েছে।

গ. ফারহানার বাবা তার কাজের সুবিধার্থে আইবিএম কোম্পানির একটি পার্সোনাল কম্পিরউটার কিনেছেন। এই কম্পিউটার দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ যেমন : লেখালেখি কিংবা হিসাব করা, তথ্যসংগ্রহ সংরক্ষণ করা, ভিডিও এডিটিং করা, গ্রাফিক্স ডিজাইন করা ইত্যাদি সন্তোষজনকভাবে করা সম্ভব। কম্পিউটারটি যদিও আইবিএম কোম্পানির তৈরি তথাপি এই কম্পিউটারে মাইক্রোসফট কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের বিরাট অবদান রয়েছে। কেননা ১৯৮১ সালে আইবিএম কোম্পানি তাদের বানানো এই পার্সোনাল কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম তৈরির দায়িত্ব দেন মাইক্রোসফট কোম্পানিকে। তখন বিল গেটস প্রথমে এমএসডস এবং তারপর উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করেন। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ কম্পিউটার পরিচালিত হয় বিল গেটসের প্রতিষ্ঠিত মাইক্রোসফট কোম্পানির তৈরি অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার দিয়ে।

ঘ. উদ্দীপকে ফারহানার বাবা একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির একাউন্টস ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা। তিনি অফিসে তার কাজের চাপ কমানোর জন্য বাড়িতে কিছু কাজ করে এগিয়ে রাখার জন্য একটি পার্সোনাল কম্পিউটার কিনে তাতে ইন্টারনেট সংযোগ লাগিয়ে নিলেন। এতে ফারহানার পড়াশোনায় বেশ সুবিধা হলো। নিচে ফারহানার প্রাপ্ত সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ করা হলো :

১. ফারহানা কম্পিউটারে তার ক্লাসের এসাইনমেন্ট সুন্দরভাবে তৈরি করতে পারে। এসাইনমেন্ট তৈরির প্রয়োজনীয় তথ্য সে ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করতে পারে।

২. অনলাইনে বসে ফারহানা বিভিন্ন পত্রিকার শিক্ষাপাতা পড়ে নিজের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে পারে।

৩. সে বিভিন্ন দেশের বড় বড় লাইব্রেরির বইপত্রের অনলাইন সংস্কার পড়তে পারে।

৪. তার পাঠ্যবইয়ের যেকোনো বিষয় বোঝার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের তথ্যাদি ব্যবহার করতে পারে।

৫. অনলাইনে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষার্থীদের সাথে একত্রিত হয়ে নিজের জ্ঞান শেয়ার করতে পারে।

৬. ইন্টারনেটে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্থানের শিক্ষার্থীদের সাথে একত্রিত হয়ে নিজের জ্ঞান শেয়ার করতে পারে

৭. নিজের ক্লাসের, অন্যান্য স্কুলের এবং অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীদের সাথে ই-মেইল, অনলাইন চ্যাটের মাধ্যমে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে এবং যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে।

৮. উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

৯. অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে।

১০. যেকোনো পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সাথে সাথে সে ইন্টারনেট থেকে তা জেনে নিতে পারে।

প্রশ্ন -৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জিয়ান আজ তার বড় ভাই জিসানের সাথে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত শিক্ষা মেলায় গিয়েছিল। সেখানে সে প্রধান অতিথি এবং শিক্ষকদের আলোচনা থেকে বুঝতে পারল খুব ধীরগতিতে হলেও আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে এক ধরনের পরিবর্তন ঘটছে। সে ই-লার্নিং নামক একটা নতুন শিক্ষা পদ্ধতির কথা জানতে পারল।

ক. পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম কী? ১

খ. "একুশ শতকের বিশ্বায়নের ধারণা" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিক্ষা মেলায় গিয়ে জিয়ান কোন শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. আমাদের দেশে উত্তম পাঠদানের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে উক্ত পদ্ধতি কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম ফেসবুক।

খ. একুশ শতকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্বায়ন (Globalization)- এর ধারণাটি ত্বরান্বিত হচ্ছে। একটি সময় ছিল যখন দেশের সীমানা তার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন আর এটি সত্য নয় বরং বিশ্বায়নের কারণে দেশের সীমা নিজের দেশের গ ি ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন-এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা যেখানে আছে সেই অংশটুকুই বাংলাদেশ। এই অর্থে বাংলাদেশের সীমানা ছড়িয়ে গেছে।

গ. শিক্ষা মেলায় গিয়ে জিয়ান যে শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছে তার নাম ই-লার্নিং।

ই-লার্নিং শব্দটি ইলেকট্রনিক লার্নিং কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। এটা বলতে আমরা পাঠদান করার জন্য সিডি রম, ইন্টারনেট, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক কিংবা টেলিভিশন চ্যানেল ব্যবহার করার পদ্ধতিকে বুঝি। ই-লার্নিং কখনই সনাতন পদ্ধতির বিকল্প নয়, এটি সনাতন পদ্ধতির পরিপূরক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আগে শ্রেণিকক্ষে বিজ্ঞানের একটা বিষয় পড়ানোর সময় অনেক কিছুই হাতে কলমে দেখানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন শ্রেণিকক্ষে পাঠ দিতে দিতে শিক্ষক ইচ্ছে করলেই মাল্টিমিডিয়ার সাহায্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের একটি এক্সপেরিমেন্ট করিয়ে দেখাতে পারেন। সেটি Interactive হতে পারে এবং শিক্ষার্থীরা নিজেরা প্রায় হাতে কলমে এক্সপেরিমেন্ট করার অভিজ্ঞতা পেতে পারে। আবার দক্ষ একজন শিক্ষকের পাঠদান ভিডিও করে নিয়ে সেটি অসংখ্য স্কুলে বিতরণ করা যেতে পারে। এভাবে ই-লার্নিং ব্যবহার করে শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক বড় বড় সীমাবদ্ধতা সমাধান করে ফেলা সম্ভব।

ঘ. আমাদের দেশে উত্তম পাঠদানের সীমাবদ্ধতা দূর করার ব্যাপারে শিক্ষা মেলায় জিয়ানের জানতে পারা শিক্ষা পদ্ধতি অর্থাৎ ই-লার্নিং অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী বিশাল। তাই স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বিশাল। নানা ধরনের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে আমাদের স্কুলগুলোতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম বলতে গেলে নেই। ল্যাবরেটরি অপ্রতুল। ফলে হাতে কলমে বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ কম। এ সমস্যা সমাধানের জন্য ই-লার্নিং অনেক বড় একটা ভূমিকা রাখতে পারে। দক্ষ একজন শিক্ষকের পাঠদান ভিডিও করে নিয়ে সেটি অসংখ্য স্কুলে বিতরণ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে বোঝানোর জন্য অনেক ধরনের সহায়ক প্রক্রিয়া ছাত্রছাত্রীদের দেয়া যেতে পারে। একজন শিক্ষক চাইলে নিজেই তার পাঠদানে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় তৈরি করতে পারেন এবং সেটি বারবার ব্যবহার করতে পারেন। এটা শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সহায়ক হবে।

প্রশ্ন -৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কৌশিকরা তিন বন্ধু মিলে ঢাকা থেকে কক্সবাজারে বেড়াতে গেল। তারা প্রথমে ঢাকা থেকে ট্রেনে করে চট্টগ্রাম পরবর্তীতে চট্টগ্রাম থেকে বাসে করে কক্সবাজার গেল। হঠাৎ একটি বন্ধু অসুস্থ হয়ে গেল। তারা ঢাকার একজন চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করলে চিকিৎসক তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করতে বলেন। পরে ঐ হাসপাতালের ডাক্তার ঢাকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তার চিকিৎসা করেন।

ক. ই-পর্চা কী? ১

খ. ই-সেবা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কক্সবাজার যাওয়ার সময় কৌশিকরা কোন ই-সেবাটি গ্রহণ করতে পারত? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. কৌশিকের বন্ধুর মতো অন্য রোগীরাও কীভাবে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে সংগ্রহ করাকে বলা হয় ই-পর্চা।

খ. ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে যেকোনো ধরনের সেবা প্রদানকে ই-সার্ভিস বা ই-সেবা বলে। ই-সেবার বৈশিষ্ট্য হলো। এটি অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে এবং হয়রানিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করে।

গ. কক্সবাজার যাওয়ার সময় কৌশিকরা ই-টিকিটিং কিংবা মোবাইল টিকিটিং নামক ই-সেবাটি গ্রহণ করতে পারত।

বাংলাদেশ সরকার দেশের মানুষের জীবন হয়রানিমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহের উদ্যোগে যেসব ই-সেবা কার্যক্রম চালু করেছে তাদের মধ্যে রেলওয়ের ই-টিকেটিং ও মোবাইল টিকিটিং অন্যতম। এই সেবার আওতায় বাংলাদেশ সরকারের কয়েকটি আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটে কাটা যায়। তবে এক্ষেত্রে যাত্রীদের ট্রেন ছাড়ার অল্প সময় পূর্বে স্টেশনে গিয়ে নির্ধারিত কাউন্টার থেকে নিজেদের টিকিট সংগ্রহ করে নিতে হয়।

উদ্দীপকে কৌশিকরা কক্সবাজার বেড়াতে গিয়েছিল। যাওয়ার পথে তারা প্রথমে আন্তঃনগর ট্রেনে করে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে গিয়েছে এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে কক্সবাজার। যেহেতু ঢাকা চট্টগ্রাম আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট অনলাইন ও মোবাইল ফোনে কাটার ব্যবস্থা ছিল তাই তারা সহজেই ই-টিকিটিং কিংবা মোবাইল টিকিটিং সেবা গ্রহণ করে ঘরে বসেই ট্রেনের টিকিট কাটতে পারত।

ঘ. কৌশিকের বন্ধুর মতো অন্য রোগীরাও ই-স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই বিশেষ চিকিৎসকের সেবা ও পরামর্শ পেতে পারে।

বাংলাদেশ সরকার দেশের জনগণের জন দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ই-স্বাস্থ্যসেবা চালু করেছে। এই সেবার আওতায় বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এ জন্য দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে একটি করে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে। দেশের যেকোনো নাগরিক যেকোনো চিকিৎসকের পরামর্শ পেতে পারেন। এছাড়া দেশের কয়েকটি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে রোগী উপজেলা থেকে জেলা সদরে না এসেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা ও পরামর্শ পাচ্ছেন।

উদ্দীপকে কৌশিক ও তার তিন বন্ধু কক্সবাজার বেড়াতে গেলে সেখানে তার বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন কৌশিক তার মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ঢাকার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে বলেন। পরে হাসপাতালের ডাক্তাররা ঢাকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা দিয়ে তাকে দ্রুত সুস্থ করে তোলেন। কৌশিকের বন্ধুর মতো অন্য রোগীরাও এভাবে ই স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে নিজেদের জন্য সুস্থ জীবনযাপন নিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন -৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তানিয়া ঢাকায় তার মামার বাসায় বেড়াতে এসেছে। মামাতো বোন রেশমা তানিয়াকে দেখে খুব খুশি হলো। রেশমা ইন্টারনেট থেকে তানিয়ার পছন্দের খাবার অর্ডার করল। এক ঘণ্টার মধ্যে বাসায় খাবার পৌঁছে দিয়ে টাকা নিয়ে বিক্রেতা চলে গেল। তানিয়া তো দেখে অবাক, সে রেশমার কাছে বিষয়টি জানতে চাইল। রেশমা বলল বর্তমানে বই থেকে শুরু করে জামা, কাপড়, খাবার, শৌখিন সামগ্রী ইত্যাদি এভাবে বিকিকিনি হচ্ছে।

ক. টুইটারের বার্তাকে কী বলা হয়? ১

খ. এমটিএস বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীকের ব্যবস্থাটি কীভাবে ব্যবসায় পরিবর্তন এনেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উপরিউক্ত ব্যবস্থাটিই হচ্ছে একুশ শতকের ব্যবসায় বাণিজ্যের স্বরূপ" বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. টুইটারের বার্তাকে টুইট বলা হয়।

খ. ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেমকে সংক্ষেপে এমটিএস বলে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেমের মাধ্যমে দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিরাপদে, দ্রুত, কম খরচে টাকা পাঠানো যায়। ১ মিনিটের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাঠানো যায়। দেশের প্রায় সকল ডাকঘরে এই সেবা পাওয়া যায়।

গ. উদ্দীপকের ব্যবস্থাটি হচ্ছে ই-কমার্স।

তানিয়া অনলাইনে খাবারের অর্ডার দিলে বিক্রেতা খাবার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে খাবারের দাম নিয়ে গেছে অর্থাৎ বাণিজ্যে ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাটি ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। সনাতন পদ্ধতিতে বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট স্থানে তার পণ্য সাজিয়ে বসে এবং ক্রেতা সশরীরে সেখানে উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে বিক্রেতার কাছ থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে আনে। কিন্তু ই-কমার্স সনাতনী এই ব্যবসায়ের ধারণাটি পাল্টে দিয়েছে। এখন ব্যবসায় বাণিজ্যে ক্রেতা বিক্রেতার সরাসরি সাক্ষাৎকার নিষ্প্রয়োজন। ই-কমার্স পদ্ধতিতে একজন বিক্রেতা তার পণ্যের ছবি, ভিডিও দিয়ে ইন্টারনেটেই তার দোকানটি খুলে বসতে পারেন। এজন্য

তার প্রতিষ্ঠানের একটি ওয়েবসাইট চালু করতে হয়। ক্রেতা অনলাইনে তার পছন্দের পণ্যটি পছন্দ করেন এবং মূল্য পরিশোধ করেন। দেশে বর্তমানে বিভিন্ন ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এই মূল্য পরিশোধের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও মূল্য পরিশোধ করা যায়। মূল্য প্রাপ্তির পর বিক্রেতা তার পণ্যটি ক্রেতার ঠিকানায় নিজে অথবা পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন। মোবাইল বা কার্ড ছাড়াও ই-কমার্সে আরও একটি বিল পরিশোধ পদ্ধতি রয়েছে। এটিকে বলা হয় প্রাপ্তির পর পরিশোধ বা ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD)। এই পদ্ধতিতে ক্রেতা বিক্রতার ওয়েবসাইটে বসে পছন্দের পণ্যটির অর্ডার দেন। বিক্রেতা তখন পণ্যটি ক্রেতার কাছে পাঠিয়ে দেন। ক্রেতা পণ্য পেয়ে বিল পরিশোধ করেন।

ঘ. উপরিউক্ত ব্যবস্থাটি হচ্ছে ই-কমার্স।

ই-কমার্স বলতে বাণিজ্যে ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করাকে বোঝায়। এটি একুশ শতকের ব্যবসায় বাণিজ্যের আধুনিক ধারণা মূলত ই-কমার্সই হলো একুশ শতকের ব্যবসায় বাণিজ্যের স্বরূপ। কারণ বর্তমানে আমরা যেসব সুপার মার্কেট, শপিংমলগুলোকে ব্যবসায় বাণিজ্যের মূল অবকাঠামো হিসেবে দেখে অভ্যস্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাবে অদূর ভবিষ্যতে এগুলোর পরিবর্তে ইন্টারনেট হবে ব্যবসায় বাণিজ্যের মূল মাধ্যম আর ক্রেডিট কার্ড বা ইলেকট্রনিক মানি স্থান করে নেবে বর্তমানে প্রচলিত কাগুজে টাকার।

বর্তমানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যেমন নিজস্ব শোরুম থাকে ই-কমার্সের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব প্রতিষ্ঠানে শোরুমের পরিবর্তে নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকবে। সেই ওয়েবসাইটে সব পণ্যের তালিকা থাকবে, থাকবে অর্ডার ফরম। ক্রেতা প্রয়োজনে তাদের ওয়েবসাইটে ঢুকে নির্দিষ্ট পণ্যের অর্ডার দিলে ঐ প্রতিষ্ঠান ঐ পণ্যটি তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেবে। আর ক্রেতা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করবে। আমাদের দেশে অনেক প্রতিষ্ঠানই ইতোমধ্যে এ ধরনের ব্যবসায় শুরু করেছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের এই পরিবর্তনের জন্য আইনকানুনের কিছু পরিবর্তন আনা হচ্ছে। বর্তমানে এই ব্যবসার প্রসার খুব একটা না হলেও একুশ শতকের ব্যবসায় বাণিজ্যের স্বরূপ হবে ই-কমার্স, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রশ্ন -৬ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মিশু ও কোয়েলি খুব ভালো বন্ধু। ছোটবেলা থেকে তারা সবসময় একই স্কুলে লেখাপড়া করেছে। অষ্টম শ্রেণিতে ওঠার পর কোয়েলি তার মা বাবার সাথে আমেরিকা চলে যায়। তারপর থেকে কোয়েলি ও মিশু ফেসবুকে যোগাযোগ বজায় রেখেছে। মিশু আজ তার বড় ভাইয়ের কাছ থেকে টুইটার ও জোপ্পা নামক দুইটি সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট ব্যবহারের কৌশল শিখল।

ক. বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক কে? ১

খ. অ্যাডা লাভলেসকে কেন প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলো ব্যবহারের সুবিধাসমূহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. মিশুর ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগ সাইটের সাথে টুইটারের কোনো পার্থক্য আছে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক হলেন গুগলিয়েলমো মার্কনি।

খ. অ্যাডা লাভলেস ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞান ও গণিতের প্রতি ভীষণ আগ্রহী ছিলেন। চার্লস ব্যাবেজ যখন ডিফারেনস ইঞ্জিন ও এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামক দুইটি গণনা যন্ত্র তৈরি করেন তখন তিনি গণনার কাজটিকে কীভাবে আরও কার্যকর করা যায় তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। ১৮৩৩ সালে চার্লস ব্যাবেজের সাথে তার পরিচয় হলে তিনি এনালিটিক্যাল ইঞ্জিনকে কাজে লাগানোর জন্য 'প্রোগামিং' এর ধারণা সামনে নিয়ে আসেন। এ কারণে তাকে প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক বলা হয়।

গ. উদ্দীপকে তিনটি সামাজিক ওয়েবসাইটের নাম উল্লেখ আছে। এগুলো হলো ফেসবুক, টুইটার ও জোপ্পা। নিচে এই ওয়েবসাইটগুলো ব্যবহারের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করা হলো :

১. এই ওয়েবসাইটগুলো ব্যবহার করে আমরা নিমেষেই যেকোনো খবর সারা বিশ্বে পৌঁছে দিতে পারি।

২. সামাজিক যোগাযোগের এসব ওয়েবসাইট ব্যবহারের ফলে ঘরে বসে অন্য দেশের মানুষের সাথে চেনা-জানা ও বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের সৃষ্টি হয় যা আমাদের মনও সমাজের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৩. এই ওয়েবসাইটগুলোর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশের মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা, সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারি এবং এর ভালো দিকগুলো আমরা গ্রহণ করতে পারি।

৪. সামাজিক যোগাযোগের এসব মাধ্যম থেকে বিভিন্ন তথ্য পেয়ে থাকি, যা আমাদের শিক্ষার্জন ও গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক উপকারে আসে।

৫. এসব ওয়েবসাইট ব্যবহার করে বর্তমানে আমরা ঘরে বসেই পৃথিবী যেকোনো বিনোদন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারি।

ঘ. মিশুর ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগ সাইটের সাথে টুইটারের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। কারণ মিশু যে সামাজিক যোগাযোগ সাইটি ব্যবহার করে তার নাম ফেসবুক। যে কেউ বিনামূল্যে ফেসবুকের সদস্য হয়ে এর মাধ্যমে বন্ধু সংযোজন, বার্তা প্রেরণ, ব্যক্তিগত তথ্যাবলি প্রকাশ, আদান-প্রদান ও হালনাগাদ করতে পারে। এছাড়া এতে অডিও ও ভিডিও প্রকাশ করা যায়। ফেসবুকে যেকোনো প্রতিষ্ঠান যেমন তাদের নিজস্ব পেজ খুলতে পারে, তেমনি সমমনা বন্ধুদের নিয়ে গ্রুপ চালু করতে পারে। মার্চ-২০১৫ অনুযায়ী এই ওয়েবসাইটির ব্যবহারকারী ১৪১৫ মিলিয়ন। অন্যদিকে টুইটার এমন একটি সামাজিক যোগাযোগ সাইট যার জনপ্রিয়তা ফেসবুকের কাছাকাছি হলেও এর এমন একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা ফেসবুকের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য হিসেবে গণ্য হয়। এই সীমাবদ্ধতাটি হলো এখানে ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ ১৪০ অক্ষরের মধ্যে তাদের মনোভাব প্রকাশ ও আদান-প্রদান করতে হয়। এজন্য এটিকে মাইক্রোব্লগিংয়ের একটি ওয়েবসাইট বলা হয়। টুইটারে ব্যব্যহারকারীর এই ১৪০ অক্ষরের বার্তাকে টুইট বলে যা ফেসবুকের ক্ষেত্রে স্ট্যাটাস নামে পরিচিতি এবং তা লেখার ক্ষেত্রে অক্ষর সীমাবদ্ধতা নেই। টুইটারের সদস্যরা অন্য সদস্যদের টুইট পড়ার জন্য তাদের অনুসরণ করতে পারেন। কোনো সদস্যকে যারা অনুসরণ করে তাদের বলা হয় অনুসারী।

প্রশ্ন -৭ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মনির আজ তার কলেজে আয়োজিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মেলায় গিয়েছিল। সেখানে সে ইন্টারনেট, ই-মেইল, মোবাইল ফোন, ওয়েবসাইট নির্মাণ, ব্লগিং, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও আইসিটির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারল। সে আরও দেখতে পেল, বিনোদনের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির সুবিশাল ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে যে বড় বিষয়টি মনিরের নজরে আসল তা হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণা। সে বিষয়টি সম্পর্কে শুনেছে কিন্তু আজ প্রধান অতিথির

বক্তব্য থেকে তার কাছে ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণাটি সুস্পষ্ট হলো। প্রধান অতিথি বললেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সকল শ্রেণির সব ধরনের মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন।'

ক. কে প্রথম ই-মেইল সিস্টেম চালু করেন? ১

খ. ই-সেবা সম্পর্কে লেখ। ২

গ. মনিরের কলেজে আয়োজিত মেলার বিষয়বস্তু বিনোদনের ক্ষেত্রে কিরূপ ভূমিকা রাখছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনের বিভিন্ন উপায়গুলো তোমার নিজের ভাষায় উপস্থাপন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক. রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন প্রথম ই-মেইল সিস্টেম চালু করেন।

খ. বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকরা এখন মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এজন্য দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে একটি করে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে। দেশের যেকোনো নাগরিক এভাবে যেকোনো চিকিৎসকের পরামর্শ পেতে পারেন। এছাড়া দেশের কয়েকটি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে রোগী উপজেলা থেকে জেলা সদরে না এসেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা ও পরামর্শ পাচ্ছেন।

গ. মনিরের কলেজে আয়োজিত মেলার মূল বিষয়বস্তু হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি বিনোদন জগতে একটা নতুন দিক উন্মোচন করেছে। এর প্রভাবে মানুষের বিনোদন গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি গুণগত পরিবর্তন এসেছে বিনোদনের ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমগুলোতে। একটি সময় ছিল বিনোদনের জন্য মানুষকে ঘরের বাইরে যেতে হতো। সিনেমা দেখতে সিনেমা হলে, খেলা দেখতে খেলার মাঠে, গান শুনতে গানের জলসায় যেতে হতো। এখন আর ঘর থেকে বের হতে হয় না, প্রথমে রেডিও তারপর টেলিশিন এসেছে। তারপর এসেছে কম্পিউটার। কম্পিউটারের সাথে ইন্টারনেট সংযুক্ত হওয়ায় মানুষ তার ঘরে বসেই পৃথিবীর সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব ধরনের বিনোদন উপভোগ করতে পারে। গান, চলচ্চিত্র, আলোকচিত্র সবকিছুই এখন কম্পিউটার দিয়ে করা যায়। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরাসরি গান বা চলচ্চিত্র উপভোগ করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই নয় রেডিও টেলিভিশনের চ্যানেলগুলোও এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে দেখা যায়। তথ্যপ্রযুক্তি উন্নত হওয়ার ফলে নতুন কিছু বিনোদন যুক্ত হয়েছে। এসবের মধ্যে অন্যতম হলো কম্পিউটার গেম। তাই এখন গেম খেলতে মাঠে যেতে হয় না ঘরে বসেই খেলা যায়। প্রযুক্তির কারণে শুধু যে নতুন নতুন বিনোদনের জন্ম হচ্ছে তা নয়, সে বিনোদনগুলো এখন একেবারে সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা এটি মাত্র শুরু, ভবিষ্যতে আইসিটি নির্ভর বিনোদন কোন পর্যায়ে যাবে সেটা কল্পনা করা অসম্ভব।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লক্ষ্যটি হলো সকল শ্রেণির সব ধরনের মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন। এটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের পুরাতন মানসিকতার পরিবর্তন করে ইতিবাচক বাস্তবতা এবং উদ্ভাবনী চিন্তা করা খুব জরুরি।

ডিজিটাল বাংলাদেশের পিছনের মূল কথাটি হচ্ছে দেশের মানুষের জন্য গণতন্ত্র, মানবাধিকার, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সুবিচার নিশ্চিত করা এবং সেগুলোর জন্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা। ডিজিটাল বাংলাদেশের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সকল শ্রেণির সব ধরনের মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমাদের পুরাতন মানসিকতার পরিবর্তন করে ইতিবাচক বাস্তবতা এবং উদ্ভাবনী চিন্তা করা খুব জরুরি। ডিজিটাল বাংলাদেশের পিছনের মূল কথাটি

হচ্ছে দেশের মানুষের জন্য গণতন্ত্র, মানবাধিকার, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সুবিচার নিশ্চিত করা এবং সেগুলোর জন্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার।

ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পের বাস্তবায়নে সরকার চারটি সুনির্দিষ্ট বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছে। সেগুলো হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনগণের সম্পৃক্ততা, সিভিল সার্ভিস এবং দৈনন্দিন জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার। এর পাশাপাশি সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হচ্ছে আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষই গ্রামে বাস করে তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রথম ধাপ হচ্ছে এই গ্রামীণ মানুষকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবার আওতায় নিয়ে আসা। সেজন্য এখনই বিশাল অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির পুরো সুবিধা পেতে হলে এক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান বাড়াতে হবে। আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে সকল কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে উৎসাহী করতে হবে। তবেই অর্জিত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ একুশ শতকের সম্পদের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বিগত শতাব্দীতে সম্পদের যে ধারণা ছিল, একুশ শতকে এসে সেটি পুরোপুরি পাল্টে গেছে। পৃথিবীর সবাই মেনে নিয়েছে যে, একুশ শতকের সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। যার অর্থ কৃষি, খনিজ সম্পদ কিংবা শক্তির উৎস নয়, শিল্প কিংবা বাণিজ্যও নয়। এখন পৃথিবীর সম্পদ হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তার কারণ শুধু মানুষই জ্ঞান সৃষ্টি করতে পারে, জ্ঞান ধারণা করতে পারে এবং জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে। পৃথিবীর সম্পদের এই নতুন ধারণাটি সারা পৃথিবীতেই মানুষের চিন্তাভাবনার জগৎটি পাল্টে দিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ এখন একুশ শতকের মুখোমুখি হওয়ার জন্য আলাদাভাবে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। তারা অনুভব করতে পেরেছে একুশ শতকের পৃথিবীটা আসলে জ্ঞানভিত্তিক একটা অর্থনীতির উপর দাঁড়াতে শুরু করেছে। তাই এখন যারা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরির বিপ্লবে অংশ নিবে তারাই একদিন পৃথিবীর চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন কেন?

উত্তর : পৃথিবীর মানুষ এক সময় বেঁচে থাকার জন্য পুরোপুরি প্রকৃতির অনুকম্পার ওপর নির্ভরশীল ছিল। তারপর এক সময় তারা বিভিন্ন যন্ত্র আবিষ্কার করে প্রকৃতি ওপর এই নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনেছে। অষ্টাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের পর মানুষ যন্ত্রের ওপর নির্ভর করে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে, পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। একুশে শতকে যখন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা হয়েছে তখন সেই একই ব্যাপারে ঘটেছে। যারা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরি করার বিপ্লবে অংশ নিবে তারাই পৃথিবীর চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। তবে এই বিপ্লবে অংশ নেয়ার জন্য বিশেষ এক ধরনের প্রস্তুতি প্রয়োজন। আর এই প্রস্তুতি নেয়ার জন্য আমাদের যেসব বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে তাদের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা হিসেবে খুব দ্রুত স্থান করে নিচ্ছে। তাই একুশ শতকে টিকে থাকার জন্য আমাদের সবাইকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রাথমিক বিষয়গুলো জানতে হবে। এই প্রাথমিক বিষয়গুলো জানা থাকলেই কেবল একজন এটি ব্যবহার করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশাল বৈচিত্র্যের জগতে পা দিতে পারবে। কিন্তু একজন যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রযুক্ত ব্যবহার করা শিখবে, অভ্যস্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সংযোজন, মূল্যায়ন করে নতুন তথ্য সৃষ্টি করতে পারবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এই দক্ষতা অর্জন করতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজে স্থান করে নিতে পারবে না। তাই একুশ শতকের দক্ষ নাগরিক হওয়ার জন্য আমাদের সবাইকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে অ্যাডা লাভলেসের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আধুনিক কম্পিউটারের জনক চার্লস ব্যাবেজ ডিফারেন্স ইঞ্জিন ও এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামে দুইটি গণনা যন্ত্র তৈরি করেন। এই ইঞ্জিনগুলো যান্ত্রিকভাবে গণনার কাজ করতে পারত। তবে গণনার কাজটি কীভাবে আরও কার্যকর করা যায় তা নিয়ে কাজ করেছিলেন অ্যাডা লাভলেস। তিনি লর্ড বায়রনের কন্যা। মায়ের কারণে তিনি ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞান ও গণিতে আগ্রহী ছিলেন। ১৮৩৩ সালে চার্লস ব্যাবেজের সাথে তার পরিচয় হলে তিনি এনালিটিক্যাল ইঞ্জিনকে কাজে লাগানোর জন্য প্রোগ্রামিং এর ধারণা সামনে নিয়ে আসেন। এ কারণে তাকে প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক হিসেবে সম্মানিত করা হয়। ১৮৪২ সালে চার্লস ব্যাবেজ তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ইঞ্জিন সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। সে সময় অ্যাডা লাভলেস ব্যাবেজের সহায়তা নিয়ে পুরো বক্তব্যের সঙ্গে ইঞ্জিনের কাজের ধারণাটি বর্ণনা করেন। কাজের ধারা বর্ণনা করার সময় তিনি এটিকে ধাপ অনুসারে ক্রমাঙ্কিত করেন। অ্যাডা লাভলেসের মৃত্যুর ১০০ বছর পর ১৯৫৩ সালে সেই নোট আবার প্রকাশিত হলে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, অ্যাডা লাভলেস তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে অ্যালগরিদম প্রোগ্রামিংয়ের ধারণাটাই প্রকাশ করেছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন ও স্টিভ জবসের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন : বিশ শতকে ইলেকট্রনিক্সের বিকাশের পর প্রথমে আইবিএম কোম্পানি মেইনফ্রেম কম্পিউটার তৈরি করে পর্যায়ক্রমে ১৯৭১ সালে মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কৃত হলে সাশ্রয়ী কম্পিউটার তৈরির পথ সুগম হয়। বিশ শতকের ষাট সত্তরের দশকে ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহার করে আরপানেটের জন্ম হয়। তখন থেকে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটারসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিকশিত হতে শুরু করে। আর এই বিকাশের ফলে তৈরি হয় ইন্টারনেট। ১৯৭১ সালে আরপানেটে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পত্রালাপের সূচনা করেন আমেরিকার প্রোগ্রামার রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন। তিনিই প্রথম ই-মেইল সিস্টেম চালু করেন।

স্টিভ জবস : মাইক্রোপ্রসেসরের আবির্ভাবের পর স্টিভ জবস ও তার দুই বন্ধু স্টিভ জজনিয়াক ও রোনাল্ড ওয়েনে ১৯৭৬ সালের ১ এপ্রিল অ্যাপল কম্পিউটার নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের হাতেই পার্সোনাল কম্পিউটারের নানা পর্যায় বিকশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ ই-লার্নিং সম্পর্কে যা জান লেখ।

উত্তর : ই-লার্নিং শব্দটি ইলেকট্রিক লার্নিং কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। এটা বলতে আমরা পাঠদান করার জন্য সিডি রম, ইন্টারনেট, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক কিংবা টেলিভিশন চ্যানেল ব্যবহার করার পদ্ধতিকে বুঝে থাকি। তবে এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে ই-লার্নিং সনাতন পদ্ধতিতে পাঠদানের বিকল্প নয়, এটা সনাতন পদ্ধতির পরিপূরক।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই ই-লার্নিংয়ের জন্য নানা উপকরণ তৈরি হতে শুরু করেছে। পৃথিবীর বড় বড় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অসংখ্য কোর্স অনলাইনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং যে কেউ সেই কোর্সটি গ্রহণ করতে পারে। বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে এবং অনেক সময়ই একজন সেই কোর্সটি নেয়ার পর তার হোমওয়ার্ক জমা দিয়ে কিংবা অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে সেই কোর্সটির প্রয়োজনীয় ক্রেডিট অর্জন করতে পাচ্ছে।

আমাদের বাংলাদেশও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের প্রযুক্তিবিদরা বাংলা কোর্স দেবার জন্য বেশ কিছু ওয়েবসাইট পোর্টাল তৈরি করেছেন এবং সারা পৃথিবী থেকে যে কেউ বাংলা ভাষায় সেই কোর্সগুলো গ্রহণ করতে পারবে। তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষ করে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার উপযোগী এই ধরনের সাইটগুলো দেশে-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবসায় ই-লার্নিং এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আমাদের দেশের জনগোষ্ঠী বিশাল। সে কারণে স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যাও বিশাল। নানা ধরনের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে আমাদের স্কুলগুলোতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম বলতে গেলে নেই। ল্যাবরেটরি অপ্রতুল, ফলে হাতে কলমে বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ খুব কম। এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ই-লার্নিং অনেক বড় একটা ভূমিকা রাখতে পারে। দক্ষ একজন শিক্ষকের পাঠদান ভিডিও করে নিয়ে সেটা অসংখ্য স্কুলে বিতরণ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে বোঝানোর জন্য অনেক ধরনের সহায়ক প্রক্রিয়া ছাত্রছাত্রীদের দেয়া যেতে পারে। একজন শিক্ষক চাইলে নিজেই তার পাঠদানে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় তৈরি করতে পারেন এবং সেটি বারবার ব্যবহার করতে পারেন।

আমাদের দেশে উত্তম পাঠদানের সীমাবদ্ধতা দূর করার ব্যাপারে ই-লার্নিং অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারলেও এক্ষেত্রে আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, এটি কোনোভাবেই প্রচলিত পাঠদানের বিকল্প নয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে পাঠদানের সময় একজন শিক্ষক সরাসরি শিক্ষার্থীদের দেখতে পারেন, তাদের সাথে কথা বলতে পারেন, ভাব বিনিময় করতে পারেন। কিন্তু ই-লার্নিংয়ের বেলায় এই বিষয়গুলো প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে বলে এই পদ্ধতিটাকে অনেকের কাছে যান্ত্রিক মনে হতে পারে। তাই এই পদ্ধতিতে সফল করতে শিক্ষার্থীদের অনেক উদ্যোগী হতে হবে। ইন্টারনেটের স্পিড বৃদ্ধি করতে হবে, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং শিখন সামগ্রী তৈরি করতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ সনাতন পদ্ধতিতে পাঠদান এবং ই-লার্নিং এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর : পৃথিবীতে পাঠদানের সনাতন পদ্ধতিটি দীর্ঘদিন ধরে মোটামুটি একই রকমভাবে কাজ করে আসছিল। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতি হওয়ার পর প্রথমবারের মতো সেই পদ্ধতিতে এক ধরনের পরিবর্তন হতে শুরু করেছে এবং ই-লার্নিং কিংবা Distance Learning নামে নতুন কিছু শব্দের সাথে আমরা পরিচিত হতে শুরু করেছি। ই-লার্নিং হচ্ছে ইলেকট্রনিক লার্নিং কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ এবং এটা বলতে আমরা পাঠদান করার জন্য সিডি রম ইন্টারনেট, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক কিংবা টেলিভিশন চ্যানেল ব্যবহার করার পদ্ধতিকে বুঝে থাকি। তবে এই পদ্ধতিটি সনাতন পদ্ধতিতে পাঠদানের বিকল্প নয়, বরং এটি সনাতন পদ্ধতির পরিপূরক।

সনাতন পদ্ধতিতে পাঠদানের সময় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পক্ষে অনেক বিষয় হাতে কলমে করে দেখানো সম্ভব হয় না। কিন্তু ই-লার্নিং পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে পাঠ দিতে দিতে শিক্ষক ইচ্ছে করলেই মাল্টিমিডিয়ার সাহায্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের একটা এক্সপেরিমেন্ট করিয়ে দেখাতে পারেন। সেটা Interactive হতে পারে এবং শিক্ষার্থীরা নিজেরা প্রায় হাতে কলমে এক্সপেরিমেন্ট করার অভিজ্ঞতা পেতে পারে।

সনাতন পদ্ধতিতে পাঠদানের সময় একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের সরাসরি দেখতে পারেন, তাদের সাথে কথা বলতে পারেন, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে নানাভাবে ভাববিনিময় করতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে। শুধু তাই নয়, তারা পাশাপাশি একে অন্যকে সাহায্য করতে পারে, একে অন্যের সহযোগী হয়ে শিখতে পারে। কিন্তু ই-লার্নিংয়ের বেলায় এই বিষয়গুলো প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। পুরো প্রক্রিয়ায় মানবিক অংশটুকু না থাকায় ই-লার্নিং পদ্ধতিটাকে অনেকের কাছে যান্ত্রিক মনে হতে পারে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ ই-গভর্ন্যান্স কী? শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই হচ্ছে ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে সরকারি ব্যবস্থাসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

শিক্ষাক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্সের প্রভাব : একটা সময় ছিল যখন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করা ছিল পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের জন্য এক বিড়ম্বনার ব্যাপার। বিশেষ করে প্রধান প্রধান শহর থেকে দূরবর্তী গ্রামে অবস্থানরতদের পক্ষে এটি ছিল দুষ্কর। মাত্র দুই দশক আগেও এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সাত দিন পরও অনেকেই তাদের ফলাফল জানতে পারত না। কিন্তু বর্তমান ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে ফলাফল জানা যায়। ফলে, ফলাফল জানার যে বিড়ম্বনা ছিল সেটির অবসান হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্সের আর একটি উদাহরণ হলো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোবাইল ফোনে আবেদন করার সুবিধা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় , পূর্বে সিলেট জেলার একজন শিক্ষার্থী যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক হলে তাকে অনেকগুলো কাজ সম্পন্ন করতে হতো। এজন্য সশরীরে অথবা প্রতিনিধিকে যশোর গিয়ে একবার ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ এবং পরে আবার আবেনপত্র জমা দিতে হতো। বর্তমানে মোবাইল ফোনেই এই আবেদন করা যায়। ফলে, ভর্তিচ্ছুদের ভর্তির আবেদন ফরম জোগাড় ও জমা দেওয়ার জন্য শহর থেকে শহরে ঘুরতে হয় না।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ বাংলাদেশের নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নে ই-গভর্ন্যান্সের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ই-গভর্ন্যান্স হচ্ছে শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ই-গভর্ন্যান্সের ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করে বাংলাদেশ সরকার এদেশের শাসন ব্যবস্থায় ই-গভর্ন্যান্সের প্রচলন শুরু করেছে। নিচে বাংলাদেশের নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নে ই-গভর্ন্যান্সের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হলো :

নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নে সুশাসনের কোনো বিকল্প নেই। আর দেশে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য দরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা। ই-গভর্ন্যান্স প্রচলনের ফলে নাগরিকের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান ঘটে এবং দেশে সুশাসনের পথ নিষ্কণ্টক হয়। আমাদের দেশে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সকল সেবা স্বল্প সময়ে, কম খরচে এবং ঝামেলাহীনভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য চালু করা হয়েছে জেলা ই-সেবা কেন্দ্র। এর ফলে আগে যেখানে কোনো কোনো সেবা পেতে আমাদের ২-৩ সপ্তাহ লাগত, সেটি এখন মাত্র ২-৩ দিনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি। শুধু তাই নয়, তথ্যের ডিজিটালকরণের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদের ৮০-৯০ শতাংশ সময় কম লাগছে। সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন দলিল, পর্চা প্রভৃতির নকল প্রধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সক্ষমতাও ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশে নাগরিক যন্ত্রণার আর একটি উদাহরণ হলো পরিসেবাসমূহের বিল পরিশোধ। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদির বিল পরিশোধের গতানুগতিক পদ্ধতি খুবই সময়সাপেক্ষ এবং যন্ত্রণাদায়ক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ কর্মময় দিন বিদ্যুৎ বিল পরিশোধেই নাগরিককে ব্যয় করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে মোবাইল ফোন কিংবা অনলাইনে এই বিল পরিশোধ করা যায়। ই-গভর্ন্যান্সের মূল বিষয় হলো নাগরিকের জীবনমান উন্নত করা এবং হয়রানিমুক্ত রাখা। ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে কোনো কোনো কার্যক্রমের সময় ২৪ × ৭ × ৩৬৫ দিনে পরিণত করা যায়। ফলে, নাগরিকরা নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ বাংলাদেশে ই-গর্ভন্যান্সের সুবিধাসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর : শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই হচ্ছে ই-গভর্ন্যান্স। গভর্ন্যান্স প্রচলনের ফলে সরকারি ব্যবস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় এর ফলে নাগরিকের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান ঘটে এবং সুশাসনের পথ নিষ্কণ্টক হয়। এজন্য বাংলাদেশ সরকার দেশের শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্স চালু করেছে। এ কারণে বাংলাদেশের নাগরিক নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ ভোগ করতে পাচ্ছে :

১. বর্তমানে এসএসসি, এইচএসসিসহ সকল পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে জানা যায়।

২. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য মোবাইল ফোনে আবেদন করা যায়।

৩. সরকারি কার্যালয়ের যেসব সুবিধা পেতে আগে ২/৩ সপ্তাহ লেগে যেত এখন মাত্র ২/৩ দিনে পাওয়া যায়।

৪. তথ্যের ডিজিটালকরণের ফলে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে ৮০-৯০ শতাংশ সময় কম লাগে।

৫. সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে নাগরিক যেকোনো সেবা অতি দ্রুত পাওয়া যায়।

৬. খুব অল্প সময়ে ঝামেলাহীনভাবে মোবাইল ফোন বা অনলাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির বিল পরিশোধ করা যায়।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ ই-সার্ভিস কী? বাংলাদেশ সরকারের চালু করা কয়েকটি ই-সার্ভিসের বর্ণনা দাও।

উত্তর : ই-সার্ভিস : ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে যেকোনো ধরনের সেবা প্রদান করাকে ই-সার্ভিস বা ই-সেবা বলে। ই-সেবার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি স্বল্প খরচে, স্বল্প সময়ে এবং হয়রানিমুক্ত সেবা প্রদান করে।

বাংলাদেশ সরকারের চালু করা ই-সার্ভিসসমূহ : বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরসমূহের উদ্যোগে এদেশের নাগরিকদের জন্য অনেক ই-সেবা চালু হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ই-সেবা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হলো :

ক. ই-পূর্জি : পূর্জি হচ্ছে চিনিকলসমূহে কখন আখ সরবরাহ করতে হবে সে জন্য আওতাধীন আখচাষিদের দেওয়া একটি অনুমতিপত্র। আখচাষিরা এখন এসএমএসের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে পূর্জির তথ্য পাচ্ছে বলে এখন তাদের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান হয়েছে। পাশাপাশি সময়মতো আখের সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় চিনিকলের উৎপাদনও বেড়েছে।

খ. ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম (এমটিএস) : বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেমের মাধ্যমে দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিরাপদে, দ্রুত ও কম খরচে টাকা পাঠানো যায়। ১ মিনিটের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাঠানো যায়।

গ. ই-পর্চা সেবা : বর্তমানে দেশের সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে সংগ্রহ করা যায়। এটিকে বলা হয় ই-পর্চা। পূর্বে পর্চা সংগ্রহ করার জন্য আবেদনকারীকে যেমন সরাসরি উপস্থিত হতে হতো তেমনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরাও গতানুগতিক পদ্ধতিতে পর্চা তৈরি করতেন। বর্তমানে এটি ই-সেবার আওতায় আসাতে আবেদনকারী যেকোনো স্থান থেকেই নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে পর্চা সংগ্রহ করতে পারেন।

ঘ. ই-স্বাস্থ্যসেবা : বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকরা এখন মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এজন্য দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে একটি করে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে। দেশের যেকোনো নাগরিক এভাবে যেকোনো চিকিৎসকের পরামর্শ পেতে পারেন। এছাড়া দেশের কয়েকটি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে রোগী উপজেলা থেকে জেলা সদরে না এসেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা ও পরামর্শ পাচ্ছেন।

ঙ. রেলওয়ের ই-টিকেটিং ও মোবাইল টিকেটিং : বাংলাদেশ রেলওয়ের কয়েকটি আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট এখন মোবাইল ফোনেও কাটা যায়। আবার অনলাইনেও টিকিট কাটার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে, নিজের সুবিধামতো সময়ে রেলস্টেশনে না গিয়েও নির্দিষ্ট গন্তব্যের টিকিট কাটা সম্ভব হচ্ছে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ ই-কমার্স সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর : একটি দেশের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের কোনো বিকল্প নেই। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ, ইন্টারনেটের উদ্ভব ও বিকাশ এবং কাগজের মুদ্রার বাইরেও ইলেকট্রনিক বিনিময় প্রথা চালু হওয়ার ফলে বাণিজ্যেরও একটি সর্বশেষ পরিবর্তন হয়েছে। এখন ইলেকট্রনিক মাধ্যমেও বাণিজ্য করা যায়, যার প্রচলিত নাম ই-কমার্স বা ই-বাণিজ্য।

যেকোনো পণ্য বা সেবা বাণিজ্যের কয়েকটি শর্ত থাকে। প্রথমত বিক্রেতার কাছে পণ্য থাকা এবং ক্রেতা কর্তৃক তার বিনিময় মূল্য পরিশোধ করা। এর প্রধান পদ্ধতি হলো বিক্রেতার সঙ্গে ক্রেতার সরাসরি যোগাযোগ। কিন্তু ইন্টারনেটের যুগে একজন বিক্রেতা তার পণ্যের ছবি, ভিডিও দিয়ে ইন্টারনেটেই তার দোকানটি খুলে বসতে পারেন। এজন্য তার প্রতিষ্ঠানের একটি ওয়েবসাইট চালু করতে হয়। ক্রেতা অনলাইনে তার পছন্দের পণ্যটি পছন্দ করেন এবং মূল্য পরিশোধ করেন। দেশে বর্তমানে বিভিন্ন ডেবিট বা কেডিট কার্ডের মাধ্যমে এই মূল্য পরিশোধের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও মূল্য পরিশোধ করা যায়। মূল্য প্রাপ্তির পর বিক্রেতা তার পণ্যটি ক্রেতার ঠিকানায় নিজে অথবা পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের (কুরিয়ার সার্ভিস) মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন।

মোবাইল বা কার্ড ছাড়াও ই-কমার্সে আরও একটি বিল পরিশোধ পদ্ধতি রয়েছে। এটিকে বলা হয় প্রাপ্তির পর পরিশোধ বা ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD)। এই পদ্ধতিতে ক্রেতা বিক্রেতার ওয়েবসাইটে বসে পছন্দের পণ্যটির অর্ডার দেন। বিক্রেতা তখন পণ্যটি ক্রেতার কাছে পাঠিয়ে দেন। ক্রেতা পণ্য পেয়ে বিল পরিশোধ করেন।

ই-কমার্সে দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান লক্ষ করা যায়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কেবল নিজেদের পণ্য বিক্রয় করে থাকে। আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রয় করে।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে আইসিটির প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও এখন কর্মক্ষেত্রে আইসিটির বহুমুখী প্রভাব ও ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে। এই প্রভাব ও পরিসর ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আইসিটির দুই ধরনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রথম প্রচলিত কর্মক্ষেত্রগুলোতে আইসিটির প্রয়োগের ফলে কর্মদক্ষতার বৃদ্ধি এবং বাজার সম্প্রসারণ, অন্যদিকে আইসিটি নিজেই নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে।

অন্যদিকে আইসিটি নিজেই একটি বড় আকারের কর্মবাজার সৃষ্টি করেছে। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার থেকে শুরু করে ওয়েবসাইট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি এখন নতুন দক্ষ কর্মীদের জন্য একটি বিরাট কর্মক্ষেত্র। কেবল দেশে নয়, আইসিটিতে দক্ষ কর্মীরা দেশের বাইরে কোনো প্রতিষ্ঠানে অথবা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে। এই কাজের একটি বড় অংশ দেশে বসেই সম্পন্ন করা যায়। আউটসোর্সিং করে এখন অনেকেই বাংলাদেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ সামাজিক যোগাযোগ কী? সামাজিক যোগাযোগের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুইটি মাধ্যমে বর্ণনা দাও।

উত্তর : সামাজিক যোগাযোগ : মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে চলাফেরা ও বিকাশের জন্য মানুষে মানুষে যোগাযোগের প্রয়োজন। তবে এখন সামাজিক যোগাযোগ বললে ভার্চুয়াল যোগাযোগ ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মানুষে মানুষে মিথস্ক্রিয়াকেই বোঝায়। এর অর্থ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ যোগাযোগ ও ভাব প্রকাশের জন্য যা কিছু সৃষ্টি, বিনিময় কিংবা আদান-প্রদান করে তাই সামাজিক যোগাযোগ।

সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় মাধ্যম : সামাজিক যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেটে প্রায় শতাধিক যোগাযোগ মাধ্যম রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় দুইটি মাধ্যম হলো-ফেসবুক ও টুইটার। নিচে এই দুইটি মাধ্যমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো :

ফেসবুক (www.facebook.com) : ফেসবুক সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি ওয়েবসাইট। ২০০৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মার্ক জুকারবার্গ তার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এটি চালু করেন। বিনামূল্যে যে কেউ ফেসবুকের সদস্য হতে পারেন। ব্যবহারকারীগণ বন্ধু সংযোজন, বার্তা প্রেরণ এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি প্রকাশ, আদান-প্রদান ও হালনাগাদ করতে পারেন। এছাড়া এতে অডিও ও ভিডিও প্রকাশ করা যায়। ফেসবুকে যেকোনো প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব পেজ যেমন খুলতে পারে, তেমনি সমমনা বন্ধুরা মিলে চালু করতে পারে কোনো গ্রুপ। মার্চ ২০১৫ অনুযায়ী বিশ্বে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৪১৫ মিলিয়ন।

টুইটার (www.twitter.com) : টুইটারও একটি সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। তবে ফেসবুকের সঙ্গে এর একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এটিতে ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ ১৪০ অক্ষরের মধ্যে তাদের মনোভাব প্রকাশ ও আদান-প্রদান করতে হয়। এজন্য এটিকে মাইক্রোব্লগিংয়ের একটি ওয়েবসাইটও বলা যায়। ১৪০ অক্ষরের এই বার্তাকে বলা হয় টুইট। টুইটারের সদস্যদের টুইট বার্তাগুলো তাদের প্রোফাইল পাতায় দেখা যায়। টুইটারের সদস্যরা অন্য সদস্যদের টুইট পড়ার জন্য সে সদস্যকে অনুসরণ করতে পারেন। কোনো সদস্যকে যারা অনুসরণ করে তাদেরকে বলা হয় অনুসারী।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ বিনোদন জগতে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে বিনোদনের জগতে একটা নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এটি ঘটেছে দুইভাবে। প্রথমত বিনোদনটি কীভাবে মানুষ গ্রহণ করবে সেই প্রক্রিয়াটিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয়ত বিনোদনের ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমগুলোতে একটা গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। নিচে এই পরিবর্তন দুইটি বর্ণনা করা হলো :

বিনোদন গ্রহণের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন : একটা সময় ছিল যখন বিনোদনের জন্য মানুষকে ঘরের বাইরে যেতে হতো। সিনেমা দেখতে সিনেমা হলে যেতে হতো, খেলা দেখতে খেলার মাঠে যেতে হতো, গান শুনতে গানের জলসায় যেতে হতো। এখন এ ধরনের বিনোদনের জন্য মানুষের আর ঘর থেকে বের হতে হয় না। প্রথমে রেডিও, তারপর টেলিভিশন এসেছে। তারপর এসেছে কম্পিউটার। কম্পিউটার সংযুক্ত হয়েছে ইন্টারনেটের সাথে। এভাবেই একসময় আমরা আবিষ্কার করেছি একজন মানুষ তার ঘরে চার দেওয়ালের ভেতরে আবদ্ধ থেকেই পৃথিবীর সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সব ধরনের বিনোদন উপভোগ করতে পারে।

বিনোদন মাধ্যমের গুণগত পরিবর্তন : তথ্যপ্রযুক্তির কারণে বিনোদন গ্রহণের প্রক্রিয়াটিতে যেরকম পরিবর্তন এসেছে ঠিক সেরকম পরিবর্তন এসেছে বিনোদনের বিষয়গুলোতে। সঙ্গীতকে ডিজিটাল রূপ দেওয়ায় এখন আমরা কম্পিউটারে গান শুনতে পারি। ঠিক একইভাবে আমরা ভিডিও বা চলচ্চিত্র দেখতে পারি। সিডি রম কিংবা ডিভিডি বের হওয়ার পর সেখানে বিশাল পরিমাণের তথ্য রাখা সম্ভবপর হয়েছে। সিনেমা হলে না গিয়ে ঘরে বসে কম্পিউটার কিংবা টেলিভিশনে ডিভিডি থেকে চলচ্চিত্র দেখা এখন খুবই সাধারণ একটা বিষয়। ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক বসানোর পর দ্রুতগতির ইন্টারনেট সহজলভ্য হতে শুরু করেছে। কাজেই এখন একজনকে আর গান শোনার জন্য কিংবা চলচ্চিত্র দেখার জন্য অডিও সিডি বা ডিভিডির ওপর নির্ভর করতে হয় না। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরাসরি গান বা চলচ্চিত্র উপভোগ করা সম্ভব হচ্ছে। শুরু তাই নয় রেডিও বা টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে দেখা যায় এবং সেগুলো অনেক সময়েই রেকর্ড করা থাকে বলে কাউকেই আর কোনো কিছুর জন্য নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করতে হয় না, যখন যেটি দেখার ইচ্ছে করে তখনই সেটা দেখতে পারে।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ বিনোদনের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের দুইটি ব্যবহার ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : প্রথমে যখন কম্পিউটার আবিষ্কার হয়েছিল তখন এর মূল কাজ ছিল হিসাব করা। তখন এর মূল্য এত বেশি ছিল যে শুধুমাত্র বড় বড় প্রতিষ্ঠান বা সরকার একটা কম্পিউটারের মালিক হতে পারত। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে কম্পিউটার সহজলভ্য হয়ে এসেছে এবং সাধারণ মানুষ তার ব্যক্তিগত কাজে এর ব্যবহার শুরু করেছে। কম্পিউটারের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় এর বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন সাধারণ মানুষ কম্পিউটারকে সম্ভবত সবেচেয়ে বেশি ব্যবহার করছে বিনোদন ক্ষেত্রে। নিচে বিনোদন ক্ষেত্রে কম্পিউটারের দুইটি ব্যবহার বর্ণনা করা হলো :

খেলাধুলা : তথ্যপ্রযুক্তি উন্নত হবার পর নতুন কিছু বিনোদনের জন্ম হয়েছে যেটি আগে উপভোগ করা সম্ভব ছিল না, তার একটি হচ্ছে কম্পিউটার গেম। সারা পৃথিবীতেই এখন কম্পিউটার গেমের বিশাল শিল্প তৈরি হয়েছে এবং নানা ধরনের কম্পিউটার গেমের জন্ম হয়েছে। কম্পিউটার গেমের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখেই আমরা আন্দাজ করতে পারি এটি বিনোদনের অত্যন্ত সফল একটি মাধ্যম। এর সাফল্যের প্রধান একটি কারণ হচ্ছে এটি ছোট শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক একজন মানুষ সবাইকেই তার নিজের রুচিমাফিক আনন্দ দিতে পারে। একজন আরেক জনের সাথে কম্পিউটার গেম খেলতে পারে, কম্পিউটারের সাথে খেলতে পারে এমনকি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বাইরের কারো সাথেও খেলতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক ক্ষেত্রেই এই বিনোদন উপভোগের তীব্রতা এত বেশি হতে পারে যে, সেটি এক ধরনের আসক্তির জন্ম দিতে পারে এবং সে কারণে কম্পিউটার গেম উপভোগ করার ব্যাপারে সারা পৃথিবীতে সবাইকে সতর্ক থাকার কথা বলা হচ্ছে।

চলচ্চিত্র : অ্যানিমেশন বা কার্টুন তৈরি করা এক সময় অনেক কঠিন একটা বিষয় ছিল। তথ্যপ্রযুক্তি এবং শক্তিশালী কম্পিউটারের কারণে এখন এটি অনেক সহজ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় সৃষ্টিশীল মানুষের সৃজনশীলতার কারণে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। সত্যিকারের অভিনেতা অভিনেত্রী ছাড়াই গ্রাফিক্স নির্ভর চলচ্চিত্রের ডিজিটাল অভিনেতা-অভিনেত্রীর জন্ম হতে শুরু করেছে। বিখ্যাত ব্যবসাসফল চলচ্চিত্রের কাল্পনিক প্রাণী ডাইনোসর কিংবা ভিন্ন জগতের প্রাণী তৈরি করার জন্য শক্তিশালী কম্পিউটার ব্যবহার করা এখন অত্যন্ত সাধারণ একটি বিষয়।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে কী বোঝায়? ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে করণীয় আলোচনা কর।

উত্তর : ডিজিটাল বাংলাদেশ : ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে গড়ে তোলা আধুনিক বাংলাদেশ বোঝানো হয়। সব ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্যমোচনের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশের পেছনের মূল কথাটি হচ্ছে দেশের মানুষের জন্য গণতন্ত্র, মানবাধিকার, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সুবিচার নিশ্চিত করা এবং এগুলোর জন্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে করণীয় : বর্তমান সরকার প্রথমবারের মতো ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে আমাদের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। যেহেতু আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষই গ্রামে থাকে তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রথম ধাপ হচ্ছে এই গ্রামীণ মানুষকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবার আওতায় নিয়ে আসা। সেজন্য এখনও বিশাল অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির পুরো সুবিধা পেতে হলে এক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান বাড়াতে হবে, আরও বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে সকল কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে সকল কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে লাগাতে উৎসাহী করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। আর তাহলেই আমরা প্রকৃত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব।